

## দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালিরা অনেক দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান ২রা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায়। ২৬শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্য ঐ দিন আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম ‘বাংলাদেশ’ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে। এ অধ্যায়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, অভ্যুদয়, মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা, বিভিন্ন দেশের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হব।

### এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনায় মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা সম্পর্কে জানতে পারব;
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- দেশের প্রতি ভালোবাসা, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব।

### মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রমনার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগণকে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শপথ পাঠ করান। এতে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি অবিচল থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা চক্রান্ত শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। পাকিস্তানি পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় অধিবেশনে যোগদান করতে অঙ্গীকার করেন। অন্যান্য সদস্যকেও তিনি হুমকি

দেন। এসবই ছিল ভুট্টো-ইয়াহিয়ার বড়যন্ত্রের ফল। ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ ভুট্টোর ঘোষণাকে অজুহাত দেখিয়ে ৩রা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কোনো প্রকার আলোচনা না করে অধিবেশন স্থগিত করার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানের সমাবেশে ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। সকল সরকারি কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুলোক হতাহত হয়। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল এক জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সকল বাঙালিকে অংশগ্রহণে আহ্বান জানান। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

### ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন, বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরেন। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল। এই ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইউনেস্কো ২০১৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ‘ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ’ (World Documentary Heritage) বা ‘বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।



চিত্র ২.১ : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দান



বঙ্গবন্ধুর ভাষণে পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিকনির্দেশনা ছিল- ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, “রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামক পরিকল্পনার মাধ্যমে নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। বাঙালিরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ায়।

কাজ  
দক্ষপত : ৭ই মার্চের ভাষণের কী কী বিষয় মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছে? তা উল্লেখ কর।

## স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচির প্রতি সাড়া দিয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করতে। এ সময় ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। অপরদিকে গোপন আলোচনার নামে কলকোপ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ১৭ই মার্চ ঢাকা খান ও রাও ফরমান আলী ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামক কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। ২৫শে মার্চ রাতে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যা ‘অপারেশন সার্চলাইট’ শুরু হয়। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ২৫শে মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা করে বহু মানুষকে। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স গিলখানা ইপিয়ার সদর দপ্তর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালায় ও নৃশংসভাবে গণহত্যা ঘটায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫শে মার্চের রাত ‘কালরাত্রি’ নামে পরিচিত। এ দিবসটি এখন ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃত। ২৬শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কাপুরুষাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭শে মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় পাকিস্তানি সশস্ত্র সেনাদের সঙ্গে বাঙালি, আনসার ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।



চিত্র ২.২ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গণহত্যা



চিত্র ২.৩ : মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা

## মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার অত্রকাননে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে এ সরকারের কার্যক্রম শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, নির্দেশনা সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও

প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল 'মুজিবনগর সরকার' গঠন করা হয়। এটি ছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। ঐ দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ'। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২. উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
৩. প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ
৪. অর্থমন্ত্রী : এম. মনসুর আলী
৫. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী : এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান
৬. পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমেদ

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী ন্যাপ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (যদিও মওলানা ভাসানীকে কলকাতায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাহ্ফুর ন্যাপ) অধ্যাপক মোজাহ্ফুর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিং, জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর, তাজউদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ (বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী)-কে নিয়ে মোট ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী।

## মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।

বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে এ সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেছিল। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এগুলো হলো-প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও যুব ও অভ্যর্থনা শিবির নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর-কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম প্রভৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করেন। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচার ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্ব ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সরকার বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১১জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করেছিল। এ ছাড়া বেশ কিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। এসব বাহিনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনা সদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ যোগদান করেন। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোঁজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার

### কাজ

দলগত : মুজিবনগর অস্থায়ী  
সরকারের কার্যক্রম চিহ্নিত কর।



মানুষ অংশ নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। এসব সংগঠন স্থানীয়ভাবে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে আহত হয়েছেন।

## মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ায়। বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা ছাড় দেয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণক্ষেত্রে শহিদ হন। আবার অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হন। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না। জাতি চিরকাল মুক্তিযোদ্ধাদের সূর্যসজ্জন হিসেবে মনে করবে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ মনে করে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন দেশপ্রেমিক, অসীম সাহসী এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ যোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি এবং অবাঙালি অংশগ্রহণ করে। তাই এ যুদ্ধকে ‘গণযুদ্ধ’ বা ‘জনযুদ্ধ’ও বলা যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র-ছাত্রী, পেশাজীবী, নারী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

মাজ
দলগত : জাতি কেন মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করবে – এটি ব্যাখ্যা কর।
দলগত : মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

## ছাত্রসমাজ

পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে বাঙালি জাতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে এদেশের ছাত্রসমাজ। ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি হানাদকার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিবাহিনীর অনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশ ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

কাজ
দলগত : মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মত্যাগ ও অবদান চিহ্নিত কর।

## পেশাজীবী

সাধারণ অর্থে বারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারাই হলেন পেশাজীবী। পেশাজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক ও বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও গৌরবদীপ্ত। পেশাজীবীদের বড়ো অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। পেশাজীবীরা মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহ, সাহায্যের আবেদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান, শরণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পেশাজীবীদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। তবে, পেশাজীবীদের একটা অংশ পাকিস্তান সরকারের পক্ষেও অবস্থান নেন।

## মুক্তিযুদ্ধে নারী

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্রচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অপরদিকে সহযোগিতা হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা—শুশ্রূষা, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান ও তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এদেশের অগণিত নারী মুক্তিসেনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্বাসিত হন লক্ষাধিক মা-বোন। তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী।

কাজ  
দলপত : মুক্তিযুদ্ধে নারীর  
অবদান মূল্যায়ন কর।



চিত্র ২.৪ : যুদ্ধ প্রশিক্ষণে নারী

ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে সরকারিভাবে তাঁদের 'বীরসন্তান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সরকার ২০১৬ সালে তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

## গণমাধ্যম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া, মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

## জনসাধারণ

সাধারণ জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুষ্টিমেয় এদেশীয় দোসর ব্যতীত সবাই কোনো না কোনোভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে, খাবার ও ঔষধ সরবরাহ করেছে, সেবা দিয়েছে ও ধ্বংসাত্মক সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ বাঙালি ও আদিবাসি জনগণ অংশগ্রহণ করে। তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যা ছিল অধিক। তাঁদের রক্তের বিনিময়েই আমাদের আজকের স্বাধীন মানচিত্র, লাল-সবুজ পতাকা।



## প্রবাসী বাঙালি

প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট প্রবাসী বাঙালিরা আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা নিরলস কাজ করেছেন।

## শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী

মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তথাপি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পত্র-পত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান-‘চরমপত্র’ ও ‘জন্মাদের দরবার’ ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে উল্লিখিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করে তুলেছে।

## মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও স্বাধীনতা বিরোধী তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ২৫শে মার্চের কলরাত্রি তথা জাতীয় গণহত্যা দিবস এবং পরবর্তী সময়ের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। গোটা বিশ্বের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানায়।

ভারতের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কলরাত্রির বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী নয় মাস ধরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। এর ফলে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়। লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। ভারত ৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী ‘যৌথ কমান্ড’ গড়ে তোলে। যৌথ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাসহ জেনারেল এ কে নিরাজী নিঃশর্তে যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার উপস্থিত ছিলেন না।



চিত্র ২.৫ : পাকিস্তানি বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান রাশিয়া। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী-ধর্ষণসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল

ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনি ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধবন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ‘ভেটো’ (বিরোধিতা করা) প্রদান করে তা বাতিল করে দেয়। ফিউবা, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

**গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকা :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতন এবং বাঙালিদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। উল্লেখ্য, লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। তাছাড়া ব্রিটিশ নাগরিক বিখ্যাত সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন পণ্ডিত রবি শংকর ও আলী আকবর খান মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও দানসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ আয়োজন করেন। ব্রিটেন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচারমাধ্যমগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ইরাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচার মাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিল। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশ্বের কোনো কোনো দেশ এদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

**জাতিসংঘের ভূমিকা :** বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে ‘ভেটো’ ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগের পরিসরও খুব সীমিত।

## মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

বিশ্বইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু এ ভূখন্ডের সংগ্রামী মানুষ এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চলের বাঙালি এবং এ ভূখন্ডে বসবাসকারী অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে নতুন যে দেশপ্রেমের জন্ম দেয়, তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শেষে জনগণ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যা বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের নিপীড়িত, স্বাধীনতাকামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।



## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুজিবনগর সরকারের কাঠামোটি ছকে উপস্থাপন কর।
২. স্বাধীনতা অর্জনে গণমাধ্যমের ভূমিকা চিহ্নিত কর।
৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা লিখ।
৪. 'স্বাধীনতা আমাদের দেশ ও জনগণের সবচেয়ে বড় অর্জন'- কথাটির পক্ষে তোমার যুক্তিগুলো লিখ।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বল হয় কেন?
২. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্ব জনমত গঠনে বিভিন্ন দেশের ভূমিকা লিখ।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন?  
ক. এম. মনসুর আলী  
খ. তাজউদ্দীন আহমদ  
গ. খন্দকার মোশতাক আহমেদ  
ঘ. এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান
২. মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব-  
i. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করেন  
ii. গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন  
iii. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য রাখেন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i ও ii  
খ. ii ও iii  
গ. i ও iii  
ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফার বাবা স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী ছিলেন। তাঁর গান শুনে সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়। অন্যদিকে তার মা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে খাবার সরবরাহ করতেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করতেন।  
ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কী নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে?  
খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুজিবনগর সরকার কেন গঠন করা হয়েছিল?  
গ. আরিফার বাবা যে মাধ্যমে কাজ করতেন, মুক্তিযুদ্ধে উক্ত মাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আরিফার মায়ের মতো অনেক নারীর ভূমিকাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ- তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে যুক্তি উপস্থাপন কর।